বাংলাদেশ : দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের প্রত্যক্ষ সহায়তায় আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে ভারতের ভূমিকা এবং বিশেষত সামরিক সাহায্য ভারতকে বাংলাদেশের মিত্রতা অর্জন করতে সাহায্য করে। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা মুজীবর রহমানের শাসনকালে (১৯৭২-১৯৭৫) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। মূজীব বাংলাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি বলবৎ করেন। বিদেশ নীতিতে মুজীবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ঠাণ্ডা যুদ্ধে কোন সামরিক জোটে যোগদানে বিরত থাকে। রাষ্ট্রগঠনে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার নীতি অনুসরণ করে। তবে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা এবং রাজনীতির অর্ন্তদ্বন্দ্ব ক্রমেই সামনে এসে পড়ে এবং মুজীবের নৃশংস হত্যার পর ভারত-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মুক্তির পর ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সর্বস্তরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বাংলাদেশে যে তীব্র জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় তা পরবর্তী কালে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের বৃহৎ আয়তন বাংলাদেশিদের ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে সন্দিগ্ধ করে তোলে। অনেক বাংলাদেশি ভাবতে শুরু করে যে, বাংলাদেশের বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা ভারতকে বেচে দিতে হবে। এই সময় বাংলাদেশে পাকিস্তানের সমর্থনকারী গোষ্ঠীর পুনরাবির্ভাব হয়। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য ও স্বাধীনতার পরে বিপুল আর্থিক সাহায্যদান সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটল মুজীবের মৃত্যুর পর।

এর সঙ্গে বাংলাদেশের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার ফলে ভারত-বিদ্বেষী মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পরিস্থিতি যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করে ভারত-বিরোধী শক্তিদের বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাহিরে যার তারা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে।। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে দুটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে ক্ষমতায় আসেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তান বাংলাদেশে এই রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামরিক অভ্যুত্থানকে পূর্ণ সমর্থন করে। ভারত এই সমস্ত ঘটনার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। এর পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্তে দুই

দেশের আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিএনপির সরকার ইসলামি মৌলবাদকে উস্কানি দিয়ে ভারত বিরোধীতাকে আরও তীব্র করার কাজে লিপ্ত হন। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গার জলবণ্টন নিয়েও তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসে মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। এরপর ধীরে ধীরে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নত হতে শুরু করে। ১৯৯৬ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক গঙ্গার জল-বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৬ সালে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী ও পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী ভারতের বিদেশ নীতিতে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির (পাকিস্তান ব্যতীত) প্রতি কিছু সদাশয়ের প্রস্তাবের কথা বলেন যা 'গুজরাল নীতি' নামে পরিচিত। এই নীতিতে বলা হয় যে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির (পাকিস্তান বাদে) সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং এর পরিবর্তে কোন কিছু শর্ত আরোপ করবে না। এই সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কোলকাতা-ঢাকা বাস পরিষেবা শুরু করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৯ সালের জুন মাসে এই বাস পরিষেবার সূচনা হয়। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় এই বাস পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। দুই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকে বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই এই বাস পরিষেবা শুরু করার কথা ভাবা হয়েছিল। কোলকাতা ও ঢাকার মধ্যে বাস পরিষেবা সূচনার পর ২০০১ সালের জুলাই মাসে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ঢাকা ও আগরতলার মধ্যে বাস পরিষেবা শুরু করার উদ্দেশ্যে। এই পরিষেবার সূচনা হয় ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এ ছাড়া ২০০০ সালের জুলাই মাসে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ভারতের পেট্রাপোলের সঙ্গে বাংলাদেশের বেনাপোলের রেল যোগাযোগ পুনরায় শুরু করার উদ্দেশ্যে। ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে পেট্রাপোলের ও বেনাপোলের মধ্যে রেল পরিষেবা পুনরায় শুরু হয় যা দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে। বর্তমানে এই রেল পরিষেবার মাধ্যমে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে শুধুমাত্র পণ্যসামগ্রীর আদান-প্রদান হয়। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যাত্রীবাহী রেল পরিষেবা সূচনার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০০১ সালের জুলাই মাসে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ কথা অনস্বীকার্য যে দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। দুই দেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ২০০০-০১ সালে ৯৪৬.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-০৫ সালে ১৬৪১.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। সাপ্টা (SAPTA - South Asian Preferential Trade Agreement) স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ভারত বাংলাদেশের বহু দ্রব্যের উপর

সমস্ত শুল্ক মাসুল হ্রাস করেছে। বর্তমান দুই রাষ্ট্রের সরকার এই অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২০০১ সালের পরবর্তী নির্বাচনে হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকার পরাস্ত হয় এবং ক্ষমতায় আসে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে একটি জোট সরকার। এই সরকারের আমলে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক হিংসা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামিক মৌলবাদী শক্তি তথা ভারত-বিরোধী শক্তির প্রভাব বাড়ছে বাংলাদেশে। এই সমস্ত অশুভ শক্তিকে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার কড়া হাতে দমন করতে ব্যর্থ হলে ভারত-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি ঘটবে, অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটবে ও ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।